ইউনিট ১০

হাঁস-মুরগী পালন

ভূমিকা

বাংলাদেশের সর্বত্র হাঁস-মুরগী পালন করা হয়। হাঁস-মুরগীর ডিম ও মাংস আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য। আজকাল বহু যুবক হাঁস-মুরগী পালন করে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। আমাদের আমিষের অভাব খুব বেশি। এই অভাব সুপরিকল্পিতভাবে হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে পূরণ করা যায়। সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে হাঁস-মুরগীর খামারের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানী করা সম্ভব।

এই ইউনিটের বিষয়বস্তু দুটি তত্ত্বীয় এবং একটি ব্যবহারিক পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ- ১: হাঁস-মুরগী পালনের উপকারিতা, উন্নত জাতের হাঁস-মুরগীর পরিচিতি ও পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন পদ্ধতি
পাঠ- ২: বাণিজ্যিকভিত্তিক হাঁস-মুরগী পালন, হাঁস-মুরগীর রোগবালাই দমন ও পরিচর্যা
পাঠ- ৩: ব্যবহারিক: ডিম ও মুরগী চিহ্নিতকরণ

পাঠ ১

হাঁস-মুরগী পালনের উপকারিতা, উন্নত জাতের হাঁস-মুরগীর পরিচিতি ও পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- হাঁস-মুরগী পালনের উপকারিতাগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- উন্নত জাতের হাঁস-মুরগী সনাক্তকরণ লক্ষণগুলো বলতে পারবেন এবং
- পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

হাঁস-মুরগী পালনের উপকারিতা

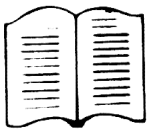

এ কথা সকলের জানা যে আমাদের দেশে আমিষের অভাব অত্যন্ত প্রকট। মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম কোনটাই আমরা পর্যান্ত পরিমাণে পাই না। অথচ আমিষের প্রয়োজন আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের। বিশেষ করে শিশুদের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশে এবং সুষ্ঠু শারীরিক গঠনে আমিষ অত্যাবশ্যক।হাঁস-মুরগী ও এদের ডিম থেকে পর্যাপ্ত আমিষ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া হাঁসমুরগী পালনে অত্যন্ত উপযোগী। অল্প পরিশ্রমে অনায়াসে পারিবারিকভাবে হাঁস-মুরগী পালন এখানে আদিকাল থেকেই চলে আসছে। একটু যত্ন সহকারে ছোট হাঁস-মুরগীর খামার ব্যাপকভাবে গড়ে তুলতে পারলে আমাদের নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানী করা সম্ভব। এর ফলে বেকার সমস্যারও সমাধান সম্ভব। আমাদের দেশে মহিলারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাসগৃহে হাঁস-মুরগী চাষ করে। তারা প্রশিক্ষণ এবং সামান্য আর্থিক সহযোগিতা ও উৎসাহ পেলে হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে দেশের জন্য প্রচুর অর্থ উপার্জন ও আমিষ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারে। হাঁস-মুরগীর পালক থেকে ঝাড়ূ ও অনেক ধরনের শৌখিন দ্রব্য তৈরি হয়। ডিম শুধু আদর্শ খাদ্যই নয়, বিভিন্ন শিল্পের আদর্শ কাঁচা মাল যেমন ডিম কালচার মিডিয়া, ছাপার কালি, শ্যাম্পু, সাবান, ভ্যাকসিন ইত্যাদি তৈরির জন্য শিল্পে ব্যবহার হয়ে থাকে। ডিমের খোসায় পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম থাকে। গুড়া করে এগুলো মুরগীকে খাওয়ান হয় এবং শস্য উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়। হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা খুব ভাল সার। আজকাল সমন্বিতভাবে হাঁস-মুরগী এবং মাছের চাষ পৃথিবীর অনেক দেশেই হয়ে থাকে।

সকল বয়সের মানুষের জন্য আমিষের প্রয়োজন। হাঁস-মুরগীর মাংস ও ডিমে পর্যাপ্ত আমিষ পাওয়া যায়। হাঁসমুরগীর বিষ্ঠা উত্তম সার। হাঁস-মুরগীর পালক, ডিম ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উন্নত জাতের হাঁস-মুরগী

আমাদের দেশী জাতের হাঁস-মুরগীর উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত জাতের হাঁস-মুরগীর উদ্ভব ঘটিয়েছে। এগুলো থেকে অধিক মাংস ও ডিম পাওয়া যায়। ঐ সকল জাতের হাঁস-মুরগী পালন অত্যন্ত লাভজনক। এবার আসুন আমরা কয়েকটি উন্নত জাতের হাঁস-মুরগীর বৈশিষ্ট্য জেনে নেই।

রেড আইল্যাণ্ড রেড (আর.আই.আর.)

এ মুরগী বাংলাদেশে বহুল পরিচিত। মাংস এবং ডিমের জন্য খুব বিখ্যাত। এটি একটি সংকর জাত। দেখতে খুব সুন্দর। পালক লাল, মাথার দিকটা ঈষৎ কাল, লেজের পালক নীলাভ, কানের লতি ও চক্ষু লালচে। এরা খুব সহজে পোষ মানে। দেহের ওজন মোরগের ক্ষেত্রে ৩-৪ কেজি এবং মুরগীর ক্ষেত্রে ২-৩ কেজি হয়ে থাকে। এ জাতের মুরগী বছরে ২০০-৩০০ ডিম দেয়। ডিমের খোলসের বর্ণ বাদামী। ডিমের ওজন গড়ে ৬০ গ্রাম।

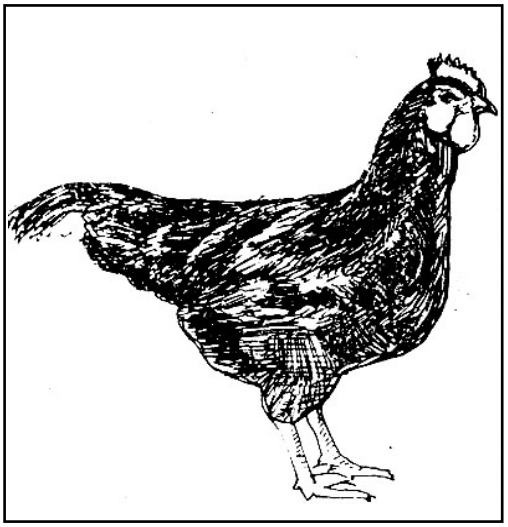

চিত্র ১০.১.১: রেড আইল্যাণ্ড রেড।

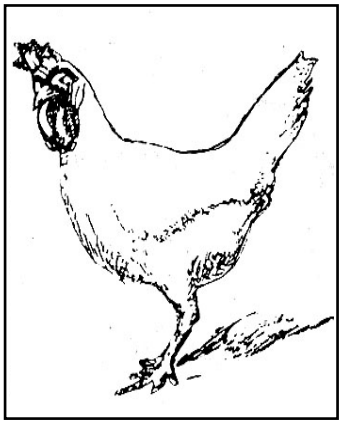

চিত্র ১০.১.২: হোয়াইট।

হোয়াইট লেগ হর্ণ

আপনারা বাংলাদেশের সর্বত্র বাণিজ্যিক ফার্ম গুলিতে ধপ ধপে সাদ মুরগী দেখে থাকবেন। এরা হোয়াইট লেগ হর্ণ। এ ছাড়া কালো, নীলাভ ও পীত বর্ণের লেগহর্ণ ও পৃথিবীর অনেক দেশে পালিত হয়ে থাকে। হোয়াইট লেগ হর্ণের পা ছোট ও হলুদ বর্ণের। ঠোট হলুদ, কানের লতি সাদা, ঝুটি সাদা। এ জাতের মুরগীর পালক অত্যন্ত বিন্যস্ত। এরা খুব কম বয়সেই ডিম দিতে শুরু করে। মোটামুটি খাবার ভাল দিলে ৬-৭ মাস বয়সেই ডিম পারতে

শুরু করে। এ জাতের মুরগীর ওজন ২$\frac{১}{২}$–৩$\frac{১}{২}$ কেজি এবং মোরগের ওজন ২-৩ কেজি। ঠিকমত খাবার দিলে প্রতিটি মুরগী ৩০০ ডিম দিয়ে থাকে। ডিমের আকার বড়, ওজন ৬০ গ্রাম। বর্ণ ধপ ধপে সাদা। আজকাল আমাদের দেশে এ জাতের ব্রয়লারের চাষের প্রসার ঘটছে। পারিবারিকভাবেও আমাদের দেশে হোয়াইট ল্যাগহর্ণ মুরগী চাষ হচ্ছে। এটা গ্রামে গঞ্জে গেলে সহজেই বুঝতে পারবেন।

দেশীয় উন্নত জাতের মুরগী

চাটগাঁ আচিল

অত্যন্ত রোগ প্রতিরোধকারী কষ্ট, সহিষ্ণু, পরিশ্রমী জাতের মুরগী চাটগাঁ আচিল। কালচে সাদা ও ফিকে এদের গায়ের রং। ঠোঁট ও পা হলুদ বর্ণের। আকারে বেশ বড়। গলা লম্বা, কানের লতি ছোট। পালক পাতলা, লেজ লম্বা ও ঝুলানো। এই মুরগী বছরে ৫০-৬০ টি ডিম দিয়ে থাকে। এদের শরীর মোটা ও মাংসল।

সরাইল আচিল

আপনারা অনেকেই কুমিল্লা জেলার সরাইলের আচিল মুরগীর সাথে পরিচিত। এরা লড়াই এর জন্য বিখ্যাত। এ জাতের মুরগী বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে, যেমন- সাদা, কালো, লাল ও সোনালী বর্ণের। পা খাট, বুক প্রসস্থ, পালক মোটা ও গলা লম্বা। এ মুরগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। এরা খুব কষ্ট সহিষ্ণু। ডিম আকারে ছোট। ডিমের সংখ্যা কম।

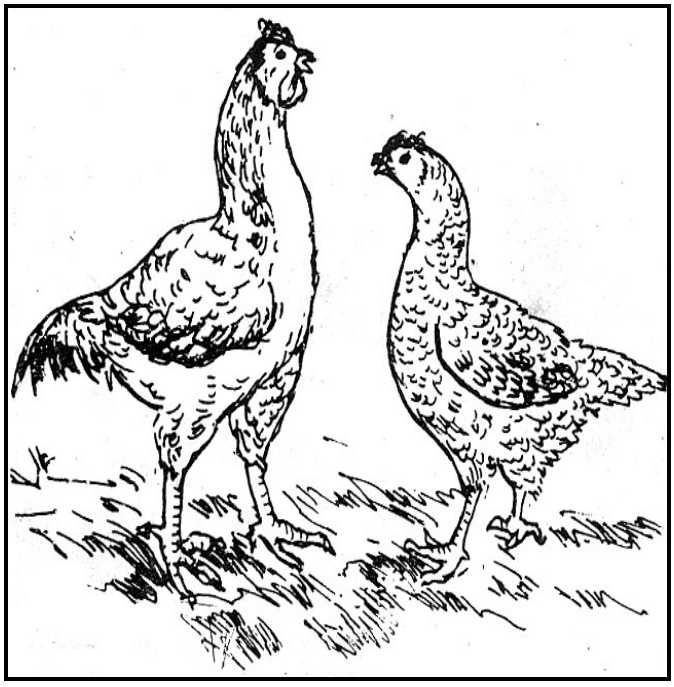

চিত্র ১০.১.৩: আঁচিল জাতের মুরগী।

হাঁস পালন

মুরগীর তুলনায় হাঁস পালন অনেক সহজ। গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হাঁস নিজেই তার খাবার যোগাড় করে বাড়িতে চৌবাচ্চা তৈরি করেও হাঁস পালন করা হয়। হাঁস মুরগীর চেয়ে বেশি ডিম দেয়। ডিমের আকার বড় হয়। হাঁসের রোগ অনেক কম। কম খরচে হাঁসের ঘর তৈরি করা সম্ভব। হাঁসের ডিম ও পালক বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। হাঁসের বিষ্ঠা ভাল সার। বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের হাঁস আছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দেশী এবং কিছু সংখ্যক উন্নত জাতের বিদেশী জাত। নাগেশ্বরী, রাজ হাঁস, খাকি ক্যাম্বেল, জিংডিং এবং ইন্ডিয়ান রানার সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

নাগেশ্বরী

এদের গলা ও বুকের পালক সাদা, শরীরের অন্যান্য অংশ কালচে। সিলেট অঞ্চলে বেশি পাওয়া যায়। ডিমের রং হাল্কা নীল। বছরে ১০০-১২৫ টি ডিম দেয়।

রাজ হাঁস

রাজ হাঁসের সংখ্যা এ দেশে খুব বেশি নয়। তবে দেশের সর্বত্রই কিছু কিছু পাওয়া যায়। রাজ হাঁস দু'ধরনের দেখা যায়। এক জাত ধূসর এবং অন্য জাত সাদা। এদের ডিম খুব বড় এবং সুস্বাদু। মাংসও বেশ সুস্বাদু। এরা এক বছরে দুবার ডিম দেয়। প্রতিবার ৮-১০ টি ডিম দেয়।

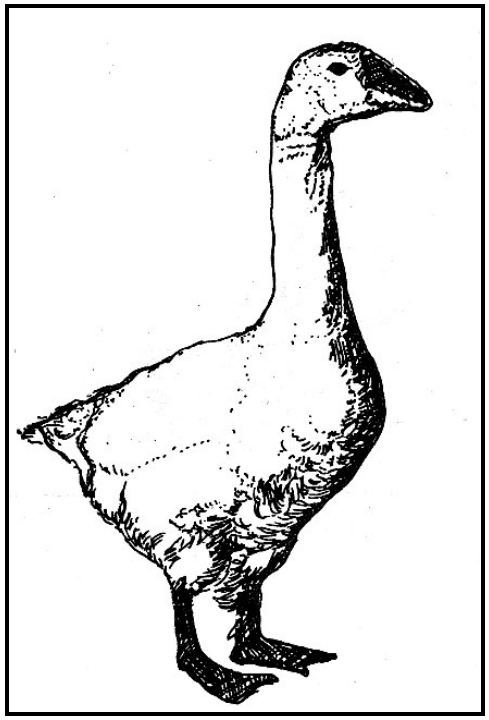

চিত্র ১০.১.৪: রাজহাস।

উন্নত জাতের হাঁস

খাকি ক্যাম্বেল হাঁস

ডিমের জন্য হাঁস খুব বিখ্যাত। বছরে এরা ২৫০-৩০০ ডিম পারে। দু ধরনের ক্যাম্বেল হাঁস আছে। সাদা ও খাকি। আমাদের দেশে খাকি জাতই বেশি পালন করা হয়।

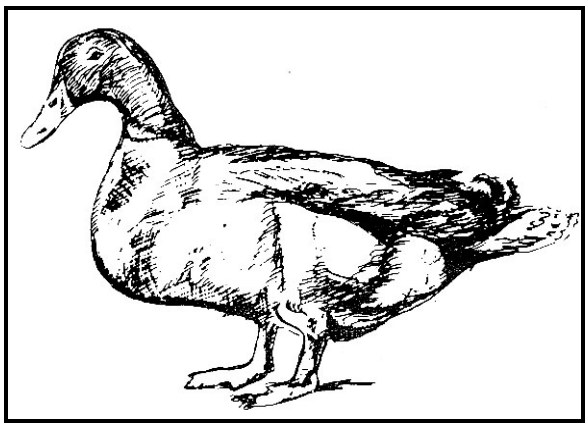

চিত্র ১০.১.৫: খাকি ক্যাম্বেল হাঁস।

জিংডিং

আদি বাসস্থান চীন দেশ। দেখতে অনেকটা খাকি ক্যাম্বেলের মত। এদের দেহ ও গলা ক্যাম্বেলের চেয়ে লম্বাটে। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বেশি। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থায় এরা টিকে থাকতে পারে। বছরে ২০০-২৫০ টি ডিম দেয়। ডিমের রং হাল্কা নীল বা সবুজাভ।

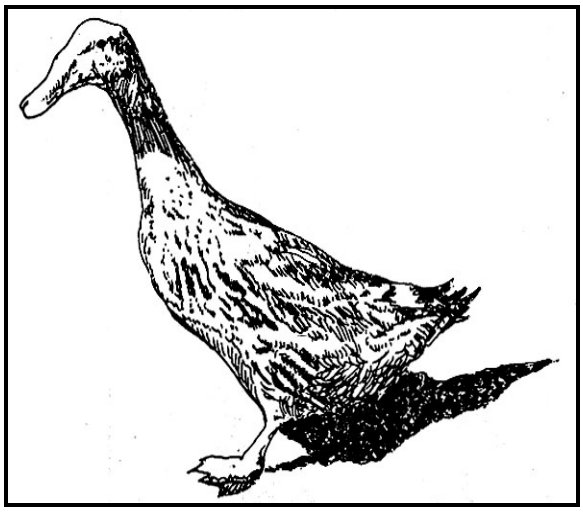

চিত্র ১০.১.৬: জিডিং হাঁস।

ইন্ডিয়ান রানার

আমাদের সকল অঞ্চলে এ জাতের হাঁস দেখা যায়। এদের পালকের রং উজ্জ্বল সাদা। এরা খুব চঞ্চল, চক্ষু উজ্জ্বল। দেহ সুগঠিত। দেখতে খুব সুন্দর। এরা বছরে ২০০-২৫০ ডিম দেয়।

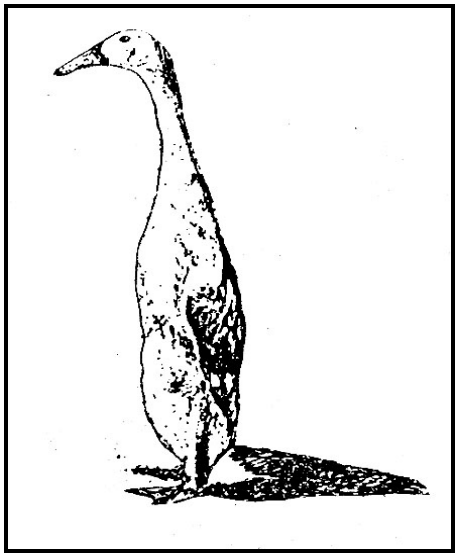

চিত্র ১০.১.৮: ইন্ডিয়ান রানার।

হাঁস আমাদের মাংস ও ডিমের অন্যতম উৎস। হাঁস কম খরচে পালন করা যায়। আধিকাংশ ক্ষেত্রে হাঁস তার নিজের খাদ্য নিজে যোগাড় করে। সামান্য সম্পরক খাদ্য দিলেই চলে। বাংলাদেশে দেশী এবং উন্নত জাতের হাঁস পালন করা হয়। নাগেশ্বরী, সাদা হাঁস, মাটি হাঁস, রাজহাঁস দেশী জাতের। খার্কি, ক্যাম্বেল, জিংডিং, ইন্ডিয়ান রানার, বেইজিং উন্নত জাতের হাঁস।

পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন পদ্ধতি

বাসস্থান

সুস্থ মোরগ মুরগী আলো বাতাসযুক্ত সুন্দর পরিবেশ থেকে পাওয়াই সম্ভব। তাই মুরগীর সুন্দর বাসস্থান নির্বাচন আবশ্যক। মুরগীর ঘর উঁচু জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয় যেন বৃষ্টির পর পানি জমে না থাকে অথবা বন্যার পানি না ঢুকে। স্যাতসেঁতে জায়গায় মুরগীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।

মুরগীর ঘর

বিভিন্ন বয়সের মুরগীর জন্য বিভিন্ন আয়তনের জায়গার প্রয়োজন। মুক্ত অবস্থায় মুরগী পালন করলে রাতে থাকার জন্য মুরগী প্রতি ৩০-৪০ সে.মি. জায়গার প্রয়োজন। আবার বদ্ধ অবস্থায় মুরগী পালনের জন্য ১.২-১.৫ বর্গ মিটার জায়গার প্রয়োজন। মুরগীর ঘরে

প্রয়োজনীয় জানালা থাকা প্রয়োজন। ১৫°-২৫° সে. তাপমাত্রা উত্তম। অবশ্য আমাদের দেশে এ তাপমাত্রা বছরের একটি বিশেষ সময়ে পাওয়া সম্ভব। ঘরের উপরে অধিক পাতাওয়ালা গাছ থাকলে ঘরে ঠাণ্ডা থাকে। তা না হলে অতিরিক্ত গরমের সময় মুরগীর ঘরের চালায় পানি ঢালতে হবে। মুরগীর ঘর সব সময় শুকনা রাখা প্রয়োজন। ঘরের মেঝেতে কাঠের গুড়া বা শুকনা খড়কুটা বিছিয়ে রাখতে হয়। এর ফলে মলমূত্র ত্যাগের পরও মুরগীর ঘর স্যাতসেঁতে হয় না। পাঁচ থেকে ছয় মাস পর পর মেঝের খড়কুটা পরিবর্তন করা আবশ্যক। ঘরের মেঝেতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছাই ছিটিয়ে দিলে ঘরে শুকনা থাকে। আবার সহজে পোকা ও রোগের আক্রমণ হয় না। মুরগীর ঘরে মধ্যে মধ্যে জীবণু নাশক স্প্রে করা প্রয়োজন।

মুক্ত মুরগীর রাতে থাকার জন্য মোরগ মুরগী প্রতি ৩০-৪০ সে.মি. জায়গার প্রয়োজন। বদ্ধ অবস্থায় পালনের জন্য ১.২-১.৫ বর্গমিটার জায়গায় প্রয়োজন। মুরগীর ঘরের তাপমাত্রা ১৫°-২৫° সে উত্তম।

মুরগীর ঘরের একদিকে ঘনপাতাযুক্ত গাছ থাকলে ঘর ঠান্ডা থাকে। মুরগীর ঘর শুকনা রাখা প্রয়োজন। মুরগীর ঘরে ছাই ব্যবহার করলে পোকা মাকড় জন্মায় না। ঘরে মাঝে মাঝে জীবাণু নাশক স্প্রে করা প্রয়োজন।

মোরগ মুরগী পালন পদ্ধতি

মারগ মুরগী সাধারণত তিন প্রকারে পালন করা যায়:

- ছাড়া বা মুক্ত অবস্থায়
- অর্ধ ছাড়া বা অর্ধমুক্ত অবস্থায়
- আবদ্ধ অবস্থায়।

ছাড়া বা মুক্ত পদ্ধতি

বাংলাদেশের সর্বত্র মহিলারা ছাড়া অবস্থায় মুরগী পালন করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে মুরগীর জন্য শুধু রাতে ঘুমাবার বা বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হয়। এ অবস্থা আপনাদের সকলেরই জানা। মুরগী নিজেই এর জীবিকার ব্যবস্থা করে। বাড়ির আশে পাশের আবর্জনা থেকে পোকা মাকড় ও অন্যান্য খাদ্য খুঁজে বের করে। খাবারে উচ্ছিষ্টগুলো এরা খায়।

বাড়ির আশে পাশে শাক সবজি, সরিষা ও ধান ক্ষেত থাকলে ছাড়া মুরগী প্রচুর ক্ষতি করে থাকে। তাছাড়া গ্রামে সাধারণত উঠানে ধান শুকানো হয়। সে ধানেরও বেশ ক্ষতি করে মুরগী। এদের আবাস স্থান ঘরের আশেপাশে বা অনেক সময় মহিলাগণ নিজেদের থাকার ঘরের কোণে করে থাকেন। অল্প জায়গায় অনেক মুরগী থাকে। এতে মুরগীর স্বাস্থ্যের খুব ক্ষতি হয়। আর এ থাকার ব্যবস্থা স্বাস্থ্য সম্মতভাবে করা হয় না। নিয়মিত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা থাকে না। এ অবস্থায় মুরগীর বাড়ন কম হয় বিধায় ডিম ও মাংস ও মুরগী থেকে কম পাওয়া যায়। চিল ও কাক ছাড়া মুরগীর বাচ্চা নিয়ে যায়। শিয়াল, বেজী বড় মুরগীর প্রাণসংহার করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. শিশুদের জন্য আমিষ অত্যাবশ্যক কেন?
   ক. খেলাধুলার শক্তি সরবরাহের জন্য
   খ. লেখাপড়ায় মনোযোগী হবার জন্য
   গ. বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশের জন্য
   ঘ. আবেগিক বিকাশের জন্য।

২. মহিলারা কিভাবে হাঁস-মুরগীর উৎপাদন বাড়াতে পারে?
   ক. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পেলে
   খ. সমাজ থেকে উৎসাহ পেলে
   গ. পরিবার প্রধান সহযোগিতা করলে
   ঘ. সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করলে।

৩. ডিমকে শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় কোথায়?
   ক. গ্লীসারিন তৈরিতে
   খ. পাউরুটি তৈরিতে
   গ. শ্যাম্পু তৈরিতে
   ঘ. জেলি তৈরিতে।

৪. দেশ বিদেশে উন্নত জাতের মুরগীর উদ্ভব ঘটেছে কিভাবে?
   ক. বাছাই এর মাধ্যমে
   খ. বিজ্ঞানীদের পছন্দ মত
   গ. সংকরায়নের মাধ্যমে
   ঘ. প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে।

৫. ডিমের জন্য সবচেয়ে বেশী বিখ্যাত কোন জাতের মুরগী?
   ক. আর. আই. আর.
   খ. হোয়াইট ল্যাগ হর্ণ
   গ. ব্ল্যাক মিনোরকা
   ঘ. অষ্টালপ।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ক, ৩। গ, ৪। ঘ, ৫। খ।

পাঠ ২

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগী পালন, হাঁস-মুরগীর রোগ বালাই দমন ও পরিচর্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগী পালনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগী পালনের পদ্ধতিগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবেন;
- বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- হাঁস-মুরগীর রোগবালাই দমন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- হাঁস-মুরগীর পরিচর্যার স্তরগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগী কেন পালন করবো?

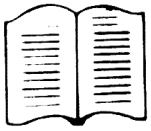

বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ড। কিন্তু তার জনসংখ্যা পৃথিবীর অনেক বড় বড় দেশের চেয়ে অনেক বেশি। এই বিশাল জনসংখ্যার প্রচুর আমিষের প্রয়োজন। দুধ, মাছ, মাংস, ডিম থেকে আমরা আমিষ পাই। বাংলাদেশে দানা জাতীয় শস্য বেশি উৎপাদন করার জন্য সমস্ত পতিত জমিতে এখন চাষাবাদ হয় ফলে ছাগল গরু পালন খুব সীমিত আকারে হয়। তাই দুধ, গোমাংস এবং ছাগলের মাংসের প্রাপ্যতা অত্যন্ত অপ্রতুল। এ অভাব মোচনের জন্য হাঁসমুরগী পালনে আমাদের বিশেষ জোর দিতে হবে। এলোপাতারি পারিবারিক খামার আমাদের এই অভাব মোচন করতে পারবে না। তাই পরিকল্পিতভাবে আমাদের বাণিজ্যিকভিত্তিক হাঁসমুরগীর খামার গড়ে তোলা প্রয়োজন। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগী সাধারণত অর্ধছাড়া বা আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয়।

আমাদের চরণভূমি দিন দিন কমে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গো মহিষের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। ফলে আমিষের অভাব প্রকট আকার ধারণ করছে। পরিকল্পিত ও ব্যাপকভাবে হাঁস-মুরগীর চাষ করে মাংস ও ডিমের মাধ্যমে আমিষের অভাব মোচন সম্ভব।

অর্ধ ছাড়া অবস্থা

বাড়ীর আশেপাশে খালি স্থানে জাল দিয়ে ঘিরে তার ভিতর মুরগী পালনই অর্ধছাড়া অবস্থা। এ অবস্থায় মুরগী পালনের জন্য প্রতিটি মুরগীর জন্য ১ বর্গমিটার জায়গা প্রয়োজন। যদি ২৫টি মুরগী পোষণের জন্য ২৫ × ২৫ বর্গমিটার ঘেরের প্রয়োজন। এই ঘেরকে রান বলা হয়। তবে এ ঘের এমন জায়গায় করতে হবে যেন পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায়। আবার প্রখর রোদের সময় ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে। ঘেরের ভিতর ২/৪টি পিয়ারা বা জাম্বুরা গাছ থাকলে ভাল হয়। ঘেরের ভিতরের জমি সমতল হওয়া প্রয়োজন। এ মাটি হাল্কা করে

কুপিয়ে বছরে অন্তত ২ বার চুন ছিটিয়ে দিলে রোগ জীবাণু ও বিষাক্ত পোকা-মাকড় জন্মাবে না। ঘেরের ভিতর প্রয়োজনীয় খাবার ও বিশুদ্ধ পানি রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। মুরগীর রাতে বিশ্রাম নেবার ও ঘুমাবার জায়গার মাটি উঁচু ও শক্ত হবে, যেন সবসময় শুকনা থাকে। থাকার ঘরে ছাই, মিশ্রিত কাঠের গুড়া, খড়কুটা ব্যবহার করতে হবে। একটু অবহেলা হলেই মুরগীর গায়ে উঁকুন হবে। এতে মুরগীর সুস্বাস্থ্যের ভীষণ ক্ষতি হয়ে থাকে। ছয় মাস অন্তর অন্তর ঘরের মেঝের কাঠের গুড়া ও খড়কুটা বদলিয়ে দিতে হবে।

বাড়ীর আশেপাশের খালি জায়গায় তারের বেড়া দিয়ে ঘেরাও করে তার ভিতর মোরগ মুরগী পোষা যায়। ঘেরাও জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। বছরে অন্তত ২ বার কুপিয়ে জায়গায় চুন প্রয়োগ করতে হবে। ফলে পোকা মাকড় ও রোগ জীবাণু আক্রমণ কম হবে। ঘেরের পর্যাপ্ত খাবার ও বিশুদ্ধ পানি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

আবদ্ধ অবস্থায় মুরগী পালন

ব্যাপক আকারে মুরগীর খামার আবদ্ধ অবস্থায়ই করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে মুরগী পালন ব্যয়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। মুরগীর খামার ও প্রতিষেধকের টীকা নিয়মিত ও সময়মত দিতে হয়। মুরগীর নিরাপত্তা ও আর্থিক লাভ ক্ষতির অবস্থা বিবেচনা করে আবদ্ধ অবস্থায় মুরগী পালন প্রয়োজন। পর্যাপ্ত সূর্যালোক, পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ পানি, সুষম খাবার ও যথার্থ প্রতিরোধক টীকার উপর এ জাতীয় খামারের সার্থকতা নির্ভরশীল।

আবদ্ধ অবস্থায় মুরগী পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে তারের জালর খাচার মুরগী পালন ও ঘরের মেঝেতে মুরগী পালন উল্লেখযোগ্য।

তারের জালে মুরগী পালন

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র ঘরের বারান্দায়, ছাদে ও ঘেরের ভিতর মুরগী পালন করা হয়। এটা আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। সাধারণত ৪৫ সে.মি. লম্বা, ৪৫ সে.মি. চওড়া ও ৪৫ সে.মি. উঁচু একটি খাঁচায় ৪টি মুরগী পালন করা যায়। খাঁচা আনুপাতিকভাবে বড় করে অধিক সংখ্যক মুরগী পোষা যায়। খাঁচার সাথে খাবারের ও পানির পাত্র এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন মুরগী অনায়াসে গলা বাড়িয়ে তা খেতে পারে। খাঁচার নিচের দিকটায় তারের জাল থাকে তাই মলমূত্র নিচে চলে যায়। খাচার তলা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন ডিম গড়িয়ে সামনের দিকে চলে যায় এবং সহজে সংগ্রহ করা যায়।

মেঝেতে মুরগী পালন

পৃথিবীর সর্বত্র এখন ঘরের মেঝেতে মুরগী পালন করা হয়। এ পদ্ধতিকে লিটার পদ্ধতি বলা হয়। ঘরের মেঝেতে খড়কুটা কড়াতের গুড়া রোগ প্রতিষেধক ঔষধ দিয়ে মুরগীর

থাকার ও ঘুরাফিরার ব্যবস্থা করা হয়। খাবার ও পানির জন্য নির্ধারিত স্থান থাকে। ৫/৬ মাস পরপর লিটার পরিবর্তন করতে হয়। এ লিটার উৎকৃষ্ট সার হিসেবে সবজি বাগানে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে মুরগী পালনের জন্য নির্ধারিত সময়ে টীকা, সুষম খাবার ও বিশদ্ধ পানি ব্যবস্থা করতে হয়। বাণিজ্যিকভাবে মুরগীর চাষ করলে বড় বড় ঘরের দরকার। কিন্তু পারিবারিক চাষে ছোট ঘর, ঘরের বারান্দা এ ব্যাপারে ব্যবহার করা যায়।

মুরগীর খাদ্য: নিচে উল্লেখিত খাদ্যগুলো বিভিন্ন বয়সের মুরগীর জন্য প্রয়োজন:

		খাদ্যের পরিমাণ (শতকরা হিসেবে)		
	খাদ্যের নাম	**বাচ্চা**	**বাড়ন্ত মুরগী**	**ডিমপাড়া মুরগী**
১.	দানা জাতীয় খাদ্য ও এ জাতীয় খাদ্যের ভূষি	৬০	৭৫	৭৫
২.	চিটা গুড়	৪	৪	২
৩.	শুটকী মাছের গুড়া	১০	৫	৭
৪.	খইল	২০	১০	১০
৫.	হাড়ের গুড়া	১	২	২
৬.	শাকসবজি	২		২
৭.	চুনা পাথর গুড়া	১	১	১
৮.	ঝিনুকের গুড়া	১	১	১
৯.	লবন	১	১	১

আবদ্ধ অবস্থায় মুরগী তারের জালের ভিতর এবং মেঝেতে পালন করা যায়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ পদ্ধতিতে মোরগ পালন করা যায়। তারের জাল এবং মেঝে দু'জায়গায়ই মুরগী পালনের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন। খাবারের পানি এবং ডিম পারা এবং ডিম সংগ্রহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক। মুরগীর বাচ্চা এবং মুরগীকে সময়মত টীকা দেওয়া প্রয়োজন। অনুমোদিত মাত্রায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পালিত মুরগীকে খাবার দিতে হয়।

ডিম বাছাই ও বাচ্চা ফুটানো

সুস্থ সবল বাচ্চার উপরই পারিবারিক খামারের সাফল্য নির্ভর করে। আর এ বাচ্চা বাছাইকৃত উৎকৃষ্ট ডিমের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। ডিম বাছাইয়ের সময় নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে।

- স্বাভাবিক আকার আকৃতির ডিমই বাচ্চা ফোটানোর জন্য উত্তম।
- খোসা– খোসা পুরু হবে এবং স্বাভাবিক রং এর হবে।
- বয়স– ডিম পারার তিন চার দিনের মধ্যে ডিম নির্বাচন করে বাঁচ্চার জন্য বসাতে হবে।
- পরিচ্ছন্নতা– বাচ্চা ফোটানোর জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ডিম নির্বাচন করতে হবে।

বাচ্চা ফোটানোর জন্য সঠিক তাপমাত্রা ৫০–৬০° ফা. সঠিক আর্দ্রতা ৭৫–৮০% থাকা প্রয়োজন। মুরগীর মাধ্যমে বাচ্চা ফোটানো হলে মুরগী নিজেই ডিমের পার্শ্ব পরিবর্তন করে আর ইনকিউবেটরে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা থাকে।

বাচ্চা ফোটানোর উত্তম সময় শীত হেমন্ত ও বসন্ত কালের মাঝামাঝি। ছোট বাচ্চাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যত্ন নিতে হয়। চিল ও কাকের হাত থেকে এদের রক্ষা করা প্রয়োজন। বাচ্চা মুরগীকে ককসি ডাই ও সীস, বর্ধিষ্ণু ও বয়স্ক মুরগীকে রাণীক্ষেত ও বসন্তের টীকা দেয়া প্রয়োজন। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁসমুরগী দুটি উদ্দেশ্যে পালন করা হয়। প্রথমত ডিম ও দ্বিতীয়ত লাভজনক হাঁস মুরগী পাওয়া যায়। লাভবান ফার্মের জন্য ডিম সংরক্ষণ এবং হাঁসমুরগীকে রোগবালাই এর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সময়মত প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করা প্রয়োজন।

সুস্থ সবল মুরগীর বাচ্চার উপরই মুরগীর খামারের সাফল্য নির্ভর করে। সুস্থ বাচ্চা পাবার জন্য উৎকৃষ্ট ডিম প্রয়োজন। এ ডিম বাছাই করে সংগ্রহ করতে হয়। বাচ্চা ফোটানোর উৎকৃষ্ট সময় শীত ও হেমন্তকাল। পারিবারিক খামারের জন্য সাধারণ মুরগীর মাধ্যমেই বাচ্চা ফোটানো হয়। বাণিজ্যিক খামারের জন্য ইনকিউবেটরের সাহায্যে ডিম ফুটানো হয়।

ডিম সংরক্ষণ

আমাদের দেশের আর্দ্রতা বেশি তাই ডিম সহজে নষ্ট হয়ে যায়। শহর ছাড়া শহরতলী ও গ্রামে গঞ্জেও এখন মুরগী পালন করা হয় এবং প্রচুর ডিম উৎপাদিত হয়। ডিমের মার্কেট বড় বড় শহর। তাই ডিম পাঠাতে দেরী হয় এবং অনেক ডিম নষ্ট হয়ে যায়। অতি সহজে এই ডিম সংরক্ষণ করা যায়। সম্ভাব্য উপায়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

চুনের পানি দ্বারা ডিম সংরক্ষণ করা: এক কেজি চুন দশ লিটার পানিতে ১০ মিনিটকাল ভিজিয়ে চুন গলে গেলে উপরের পানি সরিয়ে তাতে ডিম ১০-১৫ মি. ডুবিয়ে রেখে উঠিয়ে নিতে হবে। এতে ডিমের খোসার ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এবং ডিম ২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব।

সোডিয়াম সালফেট দ্বারা ডিম সংরক্ষণ করা: এক কেজি সোডিয়াম সালফেট ও ১০ লিটার পানি একত্রে দ্রবণ তৈরি করতে হয়। এই দ্রবণে প্রায় ১৫-২০ কেজি ডিম ২-২$\frac{১}{২}$ মাস সংরক্ষণ করা যায়। তবে ডিম এই দ্রবণে ভিজাবার আগে কোন অবস্থাতেই ধৌত করা যাবে না। পরিষ্কার ডিম বাছাই করে শুকনা কাপড় দ্বারা মুছে দ্রবণে ভিজাতে হবে।

তেল দ্বারা ডিম সংরক্ষণ: গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদহীন নারকেল বা সয়াবিন তেলে ডিম সংরক্ষণ করা যায়। তেলে ডিম এক মিনিটকাল ভিজিয়ে রাখলে খোসার ছিদ্রপথ বন্ধ হয়ে যায় এবং ডিমে পচন ধরে না।

ঠাণ্ডায় ডিম সংরক্ষণ: মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে হাড়ি বসিয়ে তার চারপাশে ৩০ সে.মি. মত কাঠ-কয়লা দিয়ে বন্ধ করতে হয়। হাড়ির ভিতর ডিম রেখে চারদিকে কয়লাতে প্রতিদিন পানি ঢেলে হাড়ির অবস্থা ঠাণ্ডা রেখে ২–২$\frac{১}{২}$ মাস পর্যন্ত ডিম সংরক্ষণ করা যায়।

হিমাগারে ডিম সংরক্ষণ: আজকাল ব্যাপকভিত্তিতে শহর এলাকায় হিমাগারে ডিম সংরক্ষণ করা হয়। হিমাগারে ডিম ১০° সে. এবং ৮০–৮৫ শতাংশ আর্দ্রতায় ডিম সংরক্ষণ করা হয়। হিমাগারের আর্দ্রতা বেশি হলে ডিমে ছত্রাক ধরে ডিমের ক্ষতি করতে পারে। হিমাগারে ডিমের সাথে অন্য কোন প্রকার খাদ্য রাখা যাবে না।

বাচ্চা ফোটানোর জন্য ডিম সংরক্ষণ: বাচ্চা ফোটানোর জন্য নিষিক্ত ডিমের প্রয়োজন। এ ডিম সংগ্রহ করে ১৫° সে. সংরক্ষণ করা আবশ্যক এবং সংরক্ষিত স্থানের আর্দ্রতা ৪৫–৭৫ শতাংশের মধ্যে আবশ্যক। এ ডিম ৭ দিনের বেশি সময় ধরে রাখা উচিত নয়।

বাণিজ্যিক খামারের মোরগ মুরগী বাছাই করার জন্য চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ কাজটি নিচে উল্লিখিত উপায়ে করা যায়–

- মোরগ-মুরগী যে বর্ণেরই হোক না কেন দেখেতে দৃষ্টি নন্দন হবে।
- শক্তিশালী হবে।
- মাথার ঝুটি, গলার ফুল, হাটু থেকে নলি পর্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণের হবে।
- নাক মুখ পরিষ্কার থাকবে।
- শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকবে।
- মোরগ খুব সকালে ডাকবে দিনের বেলায় সন্তর্পণে থাকবে।
- শত্রু দেখা মাত্র নিজেকে শক্ত করবে এবং পলায়নের ব্যবস্থা করবে।
- নিয়মিত পাখা বদল করবে।
- লেজ সোজা দাড়ানো থাকবে।

আমাদের দেশে অতিরিক্ত আর্দ্রতার দরুণ ডিম সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই যথাযথভাবে ডিম সংরক্ষণ করতে না পারলে লাভবান হওয়া যায় না। বিভিন্ন উপায়ে ডিম সংরক্ষণ করা যায়। যেমন- সোডিয়াম সালফেট দ্রবণ দ্বারা, তেলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে, পরিবেশ ঠাণ্ডা করে, হিমায়িত অবস্থায় রেখে।

হাঁস-মুরগীর প্রধান প্রধান রোগ ও দমন

হাঁস-মুরগীর মারাত্মক রোগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো–

রাণীক্ষেত

এই রোগ নিউক্যাসল রোগ নামেও পরিচিত। এ রোগে অত্যন্ত মারাত্মক। প্রতি বছর এ রোগে হাজার হাজার মোরগমুরগী মারা যায়। এ রোগের প্রধান লক্ষণ হলো– মোরগ মুরগী

চুপ করে বসে থাকে। মাঝে মাঝে মাথা ঝারা দেয়। পায়খানা চুনের মত হয়। বিষ্ঠা ও শ্লেষ্মা দ্বারা রোগ বিস্তার করে। রোগাক্রান্ত পাখী প্রায়ই মারা যায়। আর যেগুলো বেঁচে থাকে সেগুলো স্বাভাবিক ডিম ও মাংস দেয় না। প্রতিরোধক টীকাই লক্ষ লক্ষ পাখী বাঁচাতে পারে। মৃত পাখী মাটির নিচে পুড়ে দিতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মোরগ মুরগী আক্রান্ত হলেই আলাদা করে রাখতে হবে। বাজার থেকে কেনা মোরগ মুরগী পালের অন্যদের সাথে মেশানোর আগে অন্তত ৩/৪ দিন আলাদা করে রাখতে হবে। বাচ্চাদের ভ্যাকসিন দেয়া আবশ্যক।

মুরগীর বসন্ত

মুরগীর গায়ে বসন্তের গুটি দেখা দেয়। গুটি প্রথম মাথায় ও ঝুটিতে দেখা দেয়। এ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। বাজার থেকে কেনা পাখীর মাধ্যমে সহজে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। এক প্রকার ভাইরাস এ রোগের কারণ। এ রোগ দেখা দিলে অতি অল্প সময়ে ফার্মে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত মোরগ মুরগীর ঘা থেকে রোগ জীবাণু বাতাস, ধূলাবালি ইত্যাদির সাহায্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সব বয়সের পাখীরই এ রোগ হয়ে থাকে। তবে বাচ্চারা তাড়াতাড়ি আক্রান্ত হয়। কোন প্রকার কাটা ক্ষত বা আচড়ের মাধ্যমে জীবাণু দেহে প্রবেশ করে। অনেক সময় মশা-মাছির কামড়, ঝগড়াঝাটির মাধ্যমে সৃষ্ট ক্ষতের মাধ্যমে এ রোগ দেহে প্রবেশ করে। এ বসন্তের দরুন শরীরে ফোসকা উঠে, ফোস্কা পেকে ভিতরে পুঁজের সৃষ্টি করে। তারপর পুঁজ শুকিয়ে চামড়া উঠে যায়। মোরগ মুরগী আক্রান্ত হবার উপর ভিত্তি করে এ রোগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা: (১) গুটি বা চামড়ার বসন্ত, (২) মুখ ও গলার ভিতর ফোস্কার মাধ্যমে ডিপথেরিক বসন্ত (৩) চোখের বসন্ত। এ রোগের প্রতিরোধক ভ্যাকসিন ছাড়া কোন চিকিৎসা নেই।

ককসি ডাইওসিস বা রক্ত আমাশয়

পরজীবী দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। মুরগীর অন্ত্রে এ রোগের বিস্তার ঘটে। এর ফলে হজম শক্তি লোপ পায়। আক্রান্ত পাখীর মলের সাহায্যে এ রোগ দ্রুত ছড়ায়। আক্রান্ত মুরগী ঝিমাতে থাকে। মলের সাথে রক্ত মিশ্রিত থাকে। মুরগীর বাচ্চা সহজে এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত সকল ছোট বড় পাখী খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। তাড়াতাড়ি রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং মারা যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রোগ রোধে সহায়ক। ১৬% সালফা মিজাথিন সলিউশন পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে মুরগীর প্রধান শত্রু রোগ। অনেক সময় মহামারী আকারে এসব রোগ দেখা যায়। গ্রামের পর গ্রাম মুরগী উজার হয়ে যায়। রাণীক্ষেত মুরগীর বসন্ত, ককসিডাইওসিস ইত্যাদি রোগই বেশি মারাত্মক। সময়মত প্রতিষেধক এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে এ রোগসমূহ প্রতিরোধ করা যায়।

তুলনামূলকভাবে মুরগীর চেয়ে হাঁসের রোগ বেশী হয়। তবু কতগুলো মারাত্মক রোগ হাঁসের রোগ হাঁসের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। মারাত্মক রোগগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

হাঁসের প্লেগ

প্লেগে আক্রান্ত হলে হলুদ রংএর পায়খানা হয়। অনেক সময় পায়খানার সাথে রক্ত যায়। পালক এলোমেলো হয়ে যায়। পাখী ঝিমাতে থাকে। দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। রোগের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় এবং মারা যায়। এ রোগ হয়ে গেলে সেড়ে উঠার ভরসা কম। বয়স্ক হাঁস বেশি আক্রান্ত হয়। টীকার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

হাঁসের কলেরা

এটা একটি ব্যাকটেরিয়াল রোগ। অত্যন্ত ছোঁয়াছে। অল্প বয়সী হাঁস বেশি আক্রান্ত হয়। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয়। মুখ দিয়ে পানি ঝরে। পাতলা পায়খানা হয়। মাথা, কানের লতি, ঠোঁটের মাংস, কান চোখ ফুলে উঠে। আক্রমণের পর খুব অল্প সময়ে মারা যায়।

হাঁসের কৃমি রোগ

হাঁস অনেক সময় কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এতে হাঁসের ওজন কমে যায়। ডিমের সংখ্যাও কমে যায়। বাচ্চা হাঁসের বৃদ্ধি কমে যায়। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতি ৬ মাসে একবার কৃমির ঔষধ দেয়া প্রয়োজন।

হাঁসের চোখের ঘা

ভিটামিন 'সি' এর অভাব এবং পানিতে ডুবার সুযোগ কম হলে হাঁসের এ রোগ হয়। সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে চোখ অন্ধ হয়ে যায় এবং হাঁস মারা যায়।

হাঁসের রোগ মুরগীর চেয়ে কম। তবু প্লেগ, কলেরা, চোখের রোগ, কৃমি হাঁসের বেশ ক্ষতি করে। প্লেগে বয়স্ক হাঁস মরে এবং কলেরায় বাচ্চা হাঁস মারা যায়। সময়মত প্রতিরোধক ইনজেকশন দিলে হাঁসকে মড়কের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. বাংলাদেশের আমিষের অভাবের প্রধান কারণ কি?
   ক. আমিষ জাতীয় খাদ্য বিদেশে পাচার হয়ে যায়
   খ. আমিষ জাতীয় খাদ্য বিদেশে রপ্তানী করা যায়
   গ. চারণ ভূমির অভাবে গো সম্পদের উৎপাদন ক্রম হ্রাসমান
   ঘ. ধনী সম্প্রদায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমিষ ভক্ষণ করে।

২. মুরগীর ঘেরের ভিতরের মাটি কুপিয়ে চুন ছিটাতে হয় কেন?
   ক. ঝুরঝুরে মাটি থেকে মুরগী খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে
   খ. ঝুরঝুরে চুন মিশ্রিত মাটিতে পোকামাকড় ও রোগ জীবাণু জন্মায় না
   গ. ঝুরঝুরে মাটি মুরগীর সানবাথের জন্য সুবিধাজনক
   ঘ. মাটি ঝুরঝুরে করে দিলে বিষাক্ত গ্যাস বের হয়ে যায়।

৩. অর্ধছাড়া অবস্থায় একটি বয়প্রাপ্ত মুরগীর জন্য কতটুকু জায়গায় প্রয়োজন?
   ক. ৪ বর্গ মিটার
   খ. ৩ বর্গ মিটার
   গ. ২ বর্গ মিটার
   ঘ. ১ বর্গ মিটার।

৪. আবদ্ধ অবস্থায় মুরগী খামারের সাফল্য কিসের উপর নির্ভরশীল?
   ক. জৈব ও অজৈব পারিপার্শ্বিকতার উপর
   খ. মুরগীর জাত নির্বাচনের উপর
   গ. সুষম খাবার ও প্রতিরোধক টিকার উপর
   ঘ. পর্যাপ্ত আলো বাতাসের উপর।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগী পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
২. অর্ধছাড়া অবস্থায় মুরগী পালনের সুবিধাগুলো কি কি?
৩. মুরগীর মারত্মক রোগগুলোর লক্ষণ লিপিবদ্ধ করুন।
৪. আদর্শ মুরগীর বৈশিষ্ট্যগুলো সনাক্ত করুন।
৫. হাঁসের প্লেগ রোগের লক্ষণগুলো লিপিবদ্ধ করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। খ, ৩। ক, ৪। গ।

পাঠ ৩

ব্যবহারিক: ডিম ও মুরগী চিহ্নিতকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বিভিন্ন জাতের মুরগীর ডিম সনাক্ত করতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন জাতের মুরগী সনাক্ত করতে পারবেন।

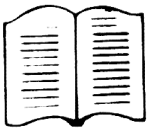

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- বিভিন্ন জাতের মুরগীর ডিম
- বিভিন্ন জাতের মুরগী।

উপকরণ প্রাপ্যতা

পারিবারিক ও বাণিজ্যিক খামার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

তত্ত্বীয় অংশ পড়ুন এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি কাজে লাগান।

কাজের ধাপ

ডিম সনাক্তকরণ

- বিভিন্ন জাতের নমুনা ডিম ছোট ছোট বাসকেট নিয়ে বাসকেটগুলো টেবিলে রাখুন।
- প্রথম মুরগীর ডিমের বর্ণ লক্ষ্যে করুন। জাতের নামসহ মুরগীর ডিমের বর্ণ কি খাতায় লিখুন।
- ডিমের আকার লক্ষ্য করুন। হাতে নিয়ে কোনটি বড় কোনটি ছোট সনাক্ত করুন।
- ডিমের গঠন লক্ষ্য করুন। কিছু পার্থক্য থাকলে খাতায় নোট করুন।
- বিভিন্ন জাতের ডিমের ওজন করুন। তত্ত্বীয় অংশের তথ্যের সাথে মিল করুন এবং খাতায় নোট করুন।
- আপনার পর্যবেক্ষণকৃত এবং ব্যবহারিক কাজের বিবরণের সাথে আপনার ২/৪ জন সহপাঠীর ব্যবহারিক কাজের নমুনা তুলনা করে আপনার সনাক্তকরণ নিশ্চিত করুন।

মুরগী সনাক্তকরণ

- বিভিন্ন জাতের মুরগী পাশাপাশি রাখুন।
- মাথার ঝুটি পায়ের নখর পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গ সনাক্ত করুন এবং নোট খাতায় নাম লিখুন। বিভিন্ন জাতের পার্থক্যগুলো স্পষ্টভাবে খাতায় লিখুন।
- আপনার নোট খাতার সাথে সহপাঠীদের খাতা মিলিয়ে আপনার সনাক্তকরণ নিশ্চিত করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. হোয়াইট লেগ হর্ণ মুরগি বছরে কতটি ডিম দিয়ে থাকে?
   ক. ৫০ – ১০০
   খ. ১০০ – ১৫০
   গ. ১৫০ – ২০০
   ঘ. ২০০ – ৩০০।

২. ব্ল্যাক মিনোরকা মুরগীর আদি বাসস্থান কোথায়?
   ক. ভারতের পূর্বাঞ্চলে
   খ. ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে
   গ. অষ্ট্রেলিয়ায়
   ঘ. আমেরিকায়।

৩. সরাইলের আঁচিল মুরগি কেন বিখ্যাত?
   ক. অধিক ডিমের জন্য
   খ. অধিক মাংসের জন্য
   গ. লড়াইয়ের জন্য
   ঘ. উত্তম পদ্ধতিতে ডিমে তা দেবার জন্য।

৪. কোন জাতের হাঁস বেশি ডিম দেয়?
   ক. মাটি হাঁস
   খ. জিং ডিং
   গ. খর্কি ক্যাম্বেল
   ঘ. বেইজিং।

৫. বদ্ধ অবস্থায় মুরগী পালার জন্য মুরগী প্রতি কতটুকু জায়গার প্রয়োজন?
   ক. ১.২ – ১.৫ বর্গ মিটার
   খ. ১.৫ – ১.৭৫ বর্গ মিটার
   গ. ১.৭৫ – ২.০০ বর্গ মিটার
   ঘ. ২.০০ – ২.২৫ বর্গ মিটার।

৬. হাঁসের কলেরা রোগ কি কারণে ঘটে?
   ক. ভাইরাস আক্রমণে
   খ. ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে
   গ. ক্রিমির আক্রমণে
   ঘ. ছত্রাকের আক্রমণে।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগী পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
২. অর্ধছাড়া অবস্থায় মুরগী পালনের সুবিধাগুলো কি কি?
৩. মুরগীর মারাত্মক রোগগুলোর লক্ষণ লিপিবদ্ধ করুন।
৪. হাঁস-মুরগী পালার উপকারিতা বর্ণনা করুন।
৫. হোয়াইট লেগ হর্ণ মুরগীর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।
৬. ইন্ডিয়ান রানার হাঁসের বৈশিষ্ট্য কি কি?
৭. হাঁসের প্লেগ রোগের লক্ষণগুলো উল্লেখ করুন।
৮. হাঁসের চোখের ঘা কেন হয়?

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। খ, ৩। গ, ৪। গ, ৫। ক, ৬। খ।